Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 234 – 243
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

ইতিহাস ও সাহিত্য : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ও উপন্যাসে প্রান্তজন

রাহুল সেখ
সহকারী অধ্যাপক
ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ (গার্লস উইং)
Email ID : sahiulzamal@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

History, Literature, Lower class, social conflicts, social status, social change, Indigenous peoples, Caste, folk culture, and Occupation.

Abstract

Since time historical, the lower classes people have remained barytas in the page of history. Literature have more often than managed to do, what history has not by highlight the conditions of these deprived classes about the Indian social system. Tarashankar Bandyopadhyay's Lokayat is the storyteller of life. Tarashankar is the painter of those who are deprived, oppressed, helpless, wretched, fighting at the edge of degradation. He wrote about the poor, the downtrodden, those who are helpless, oppressed, exploited, neglected, untouchable, stupid and who now have any status in society. The lower classes, tribals, nomads, Bedes who are deprived of the light of the ongoing civilization have painted their lives realistically and vividly--like the great procession of Haris, Muchis, Dom, Bagdi, Bedes. While writing the history and literature of the lower classes of society like Patau, Malakar, Kahar, Santal he acquired first-hand knowledge of their way of life, their spoken language and full knowledge of their normal domestic, social, and worldly life. A perusal of Tarashankar Banerjee's short stories and novels reveals the ethnographic, economic, social, and cultural history of a large community irrespective of the community in a particular region. Although he is not a sociologist and historian, his short stories and novels based on deep analysis of the position of marginalized people in the basic structure of society, their behaviour and lifestyle can be said to be an invaluable reference of time and social life.

Discussion

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাসের আলোচনা এক সুনির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ইতিহাসের আলোচনায় বিভিন্ন তত্ত্ব ও তত্ত্বকথা উঠার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সমাজের সার্বিক ইতিহাস রচনার দিকে ঝোঁক লক্ষ করা যায়। প্রথমে সার্বিক

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 234-243
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ইতিহাস রচনা করার লক্ষে ফরাসি আনাল (Annals) গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা সার্বিক প্রচেষ্টা করেছিল।এছাড়া মার্কসীয় ও গ্রামশির দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে মার্কসবাদী ও নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদরা সমাজের প্রান্তিক ও নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছেন। তথ্যের ভ্রান্তি ও তথ্যের বিকৃতি ও ইতিহাসবিদদের মনোমত তথ্য না হওয়ার সমাজের প্রান্তজন বা অন্ত্যজ মানুষের ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়নি। নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ হিসাবে বিখ্যাত অধ্যাপক রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গের সঠিক ইতিহাস রচনা করতে না পেরে সাহিত্যর মাধ্যমে সমাজের বিষয়কে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ইতিহাস ও নৃতাত্ত্বিক বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অমিতাভ ঘোষের মতো ব্যক্তি সাহিত্য সাধনা করেছেন। সাহিত্যকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। ইতিহাস হল সমাজের বাস্তবচিত্র। তবে একটা বিষয়ে বির্তক আছে তাহল সমাজের সত্য কোন বিষয়ের মাধ্যমে বেশি উঠে আসে। ইতিহাস দর্শনের[১] সঙ্গে এরিষ্টটটের সাহিত্যতত্ত্ব[২] ও মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব[৩] আলোচনা করলে ভিন্ন ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। যাই হোক ইতিহাস ও সাহিত্য সমাজের কথা বলে থাকে। অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্তের কথা ধার করে বলতে ইচ্ছা করে ইতিহাসের বড় সময়ের সঙ্গে সাহিত্যের ছোটসময় ও ব্যক্তিগত সময়কে যুক্ত করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক দিক তুলে ধরা যেতে পারে। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী ইতিহাস লিখতে গিয়ে কেবলমাত্র ইতিহাসের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, কখনও তাঁর লেখায় এসেছে সাহিত্য বা কখনও এসেছে দর্শন আবার তিনি ইতিহাস লিখতে গিয়ে মনস্তত্ত্বকেও টেনে এনেছেন।[৪] উনবিংশ শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সমাজচৈতন্যে তুলে ধরার অন্যবদ্য কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নাম উল্লেখযোগ্য। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর তাঁর সমসাময়িক দ্বন্দ্বচঞ্চল সমাজের রূপশিল্পী। তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে মানুষ ও সমাজ, স্বসমাজের দ্বান্দ্বিক বিকাশ ও সামাজিক শ্রেণিবৈরী এবং সমকালীন রাজনীতি।[৫]

১৮৯৮ সালের ২৩ জুলাই অবিভক্ত বাংলার বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদারবংশে তাঁর জন্ম। কবি হিসাবে প্রথম লেখালেখি, তারপর নাট্যক রচনা, ছোটগল্প রচনা, সবশেষে উপন্যাস রচনার মাধ্যমে বিখ্যাত হয়ে উঠা। তিনি ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যেমে সাহিত্য চর্চা করতে গিয়ে সমাজের প্রান্তজন শ্রেণি তথা প্রান্তজন মানুষদের কথা তুলে ধরেছেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে স্মরণিকায় প্রকাশিত 'ইতিহাস ও সাহিত্য' প্রবন্ধে তারাশঙ্কর বলেছিলেন –'আমি ইতিহাসের পন্ডিত নই।আমি লেখক, প্রধানত সমসাময়িক কালের, আমার চারিপাশের, আমার দেশের মানব-জীবনের কথা বলে, আমার বোধমত সেই জীবনকে সাধারণের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছি। তারই সঙ্গেই চেয়েছি সেই খন্ড কালের পৃথিবীর এক অংশের মানব জীবনে সর্বকালের সার্বভৌম সনাতন মানব-জীবনের মূল বৃত্তিকে, সংস্কারকে এবং মৌল আবেগকে ধরে রাখতে'। তিনি ৬৫টি উপন্যাস, ৫৩টি গল্পসংকলন, ১২টি নাটক, ৪টি প্রবন্ধ-সংকলন, ৪টি স্মৃতিকথা, ২টি ভ্রমণকাহিনি, একটি কাব্যগ্রন্থ এবং একটি প্রহসন রচনা করেন।[৬] ৩৫টি ছোটোগল্পে প্রধান চরিত্র হিসাবে মুচি, মাঝি, বাউরি, বাগদী, কোনাই, ডোম, বেদে, মালাকার, হাড়ি, জেলে, সাঁওতাল এবং চন্ডাল প্রমুখ প্রান্তজনরা ও ১৫টি ছোটগল্পে বৈষ্ণব ও বাউলরা উঠে এসেছে। আর উপন্যাস রাঢ় বাংলা, সামন্তসমাজ, তৎকালীন রাজনীতি ও প্রান্তজনদেরকে নিয়ে রচিত হয়েছে। রাঢ় বাংলায় বেড়ে ওঠা লেখক ইতিহাসের উপলব্ধি নিয়ে নৃতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যেমে রাঢ় বাংলার প্রতিটি মানুষকে খুব কাছে থেকে দেখছেন। প্রান্তিক মানুষের সামাজিক অবস্থা, মনোভাব, জীবন জীবিকা, সামাজিক পরিবর্তন, প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয় সাহিত্যিক তুলির মাধ্যমে জীবন্ত ছবি এঁকেছেন। সমাজের প্রান্তজন মানুষরা হয়ে উঠেছে তার গল্পের প্রধান উপজীব্য। জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন আধুনিক যুগে আঞ্চলিক সাহিত্যের পথিকৃৎ হলেন শৈলজানন্দ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের আঞ্চলিক সাহিত্যে ব্যাপকতা ও পূর্ণতা পেয়েছে। উত্তর-রাঢ়ের মাটি ও সমাজ ঐ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে মিশে তাঁর রচনা অবিনশ্বর হয়ে উঠেছে।[৭] তার রচনায় স্বাধীনতার আগের ও পরের প্রেক্ষাপট লক্ষ করা যায়। গ্রাম সমাজ পরিবর্তন ও প্রান্তজন মানুষের উপর ঔপনিবেশিক প্রভাব এবং স্বাধীনতার পরবর্তীতে গ্রামীন সমাজের আচার-আচরণ ও জীবনযাত্রার সৌন্দর্য ও বাস্তব রূপকে গভীরভাবে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

একমাত্র কবিতা সংকলন ত্রিপত্র ও দুই পরুষ, পথের ডাক, চকমকি, দ্বীপান্তর, যুগবিপ্লব, কালরাত্রি ও সংঘাত ইত্যাদি নাটকগুলোতে প্রান্ত ভাবনা ও কথার আভাস পাওয়া গেলেও তারাশঙ্কর ছোটগল্প ও উপন্যাসের মাধ্যমে

প্রান্তিক মানুষের কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই তারাশঙ্করের সম্পর্কে বলেছেন - তোমার মতো গাঁয়ের মানুষের কথা আগে আমি পড়িনি।[৮] তারাশঙ্করের আখড়াইয়ের দীঘি, তারিণী মাঝি, নারী ও নাগিনী, বেদে, ডাইনী কিংবা পৌষলক্ষ্মী-র মতো আশ্চর্য কিছু শিল্প-সফল গল্পগুলিতে আছে প্রান্তিক মানুষদের কথা।[৯] আখড়াইয়ের দীঘি গল্পে কালী বাগদি তথা বাগদী সম্প্রদায়ের অপরাধ প্রবণ হওয়ার সমাজের বাস্তব পটভূমির চিত্র অঙ্কন করেছেন সেই সময়ের প্রেক্ষিতে। অপরাধ-প্রবণতা বাগদিদের মধ্যে কেন, তার কারণ - আসামি কালী বাগদির জবানবন্দী অনুসারে এই রকম- 'আমরা জাতে বাগদী আমরা এককালে নবাবের পল্টনে কাজ করতাম। আজও আমাদের কুলের গরম - লাঠির ঘায়ে, বুকের ছাতিতে। কোম্পানির আমলে পল্টনের কাজ যখন গেল, তখন থেকেই এই আমাদের ব্যবসা'। কৃষিকর্ম তারা করতে চায়নি, অন্য চাকরিও তাদের ভাল লাগে না, কারণ নীচ কাজ করা, গাড়ু বওয়া, মোট মাথায় করা, জুতো খেলা তাদের ভালো লাগে না। মুক্ত স্বাধীন লাঠিয়াল বৃত্তি তাদের প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়েছে।[১০] স্বর্গমর্ত উপন্যাসে বাগদি সমাজের বাস্তব জীবন বিন্যাস তুলে ধরা হয়েছে। রাঢ় বাংলার লোকায়ত সমাজে বাগদি, ভল্লা ও লেট প্রভৃতি গোষ্ঠীর নিজস্ব ঐতিহ্য আছে।[১১] বাগদিদের বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। চাষবাস করা, নৌকা চালানো, মাছ ধরা এদের পেশা। বাগদি শ্রেণীর মধ্যে যারা সবচেয়ে উঁচু তাদেরকে তেঁতুলিয়া বলা হয়। অতীতকালে বাগদিরা দক্ষ লাঠিয়াল হিসেবে নিযুক্ত হত এবং পেশা হিসেবে চুরি ডাকাতিকে বেছে নিত। বাগদিদের একটি শাখা হল ভরা গোষ্ঠী। বাইরের দিক দিয়ে ভরারা শান্ত হলেও একসময় তারা ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ ছিল। দেহের শক্তি ও লাঠি চালনায় তারা পারদর্শী। বাগদিদের লেট নামে আরেকটি শাখা আছে। তবে লেটরা তা অস্বীকার করে, বাগদিদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কও তারা করে না। এরা জাল বোনে, মাছ ধরে, কৃষিকাজ করে, চৌকিদারি বা দিনমজুরি করে আবার কেউবা ডাকাতিও করে।[১২] তারণী মাঝি'র পটভূমি ময়ূরাক্ষী নদী। নদীতে বান এলেই তার পেশাগত নিশ্চয়তা। সামান্য জল থাকে না যে নদীর, সেখানে মাঝি'র জীবন অনিশ্চিত। মাঝিদের জীবনের বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন।[১৩]

নারী ও নাগিনী, বেদেনী গল্পে বেদে সম্প্রদায় সম্পর্কে তারাশঙ্কর প্রচুর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন-বেদিয়ারা আসত। দেশী বেদিয়া সাপুড়ে। এরা সাধারণত আসত বর্ষার সময়, মাঠে আল-কেউটে ধরতে। গ্রামে সাপ দেখিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করত, বাঁদরও নাচাত, আর চলত। ওরা যেত মেদিনীপুর পর্যন্ত। সাপ সম্পর্কে প্রচলিত আদিম বিশ্বাস ও সাপের দেবী মনসা বহু পূজিত লৌকিক দেবী প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তার সম্পূর্ণ ধারণা দিয়েছেন। সাপ সম্পর্কিত বহু ব্রতকথা, উপকথা, অভ্যাস, পেশা, লৌকিক বিশ্বাস তারাশঙ্করের ছোটগল্পে পাওয়া যায়।[১৪] 'বেদেনী' গল্পে তারাশঙ্কর বলেছেন এরা নিজেদের মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিলেও এদের নাম ও আচার হিন্দুদের মতো। হিন্দুদের ব্রত পালন করে, হিন্দু দেব-দেবীর পূজা করে। সাপ ধরে, সর্পদংশনের ঔষধ বিক্রি করে, সাপ নিয়ে খেলা দেখিয়ে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। সাপুড়ে বেদেরাই একটি গ্রাম সমাজে একটি শ্রেণী হিসাবে গণ্য। বিষবেদেরা সাপে কামড়ানো ব্যক্তির চিকিৎসা করে, সাপের বিষ বের করে কবিরাজের কাছে বিক্রি করে। এই বেদে যাযাবর, কোনো স্থায়ী ঠিকানা না থাকায় এরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করে।'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসকে পুরাকথা বা নৃতত্ত্বের (literary anthropology) ফল হিসেবে গণ্য করা হয়।[১৫] মেটেল, মাল, মাঝি, বিষবেদে ও বেদেদের কথা তারাশঙ্করের অন্য কিছু রচনায় পাওয়া যায়।

বাজীকরী, ডাইনি, যাদুকরী, চোর, খাজাঞ্চিবাবু প্রভৃতি গল্পে গোষ্ঠী বা বর্গের কথা উল্লেখ করেছেন।যাদুকরী বা বাজিকরী গল্পে রাঢ় বাংলার নান্দনিক কাজকর্মে যুক্ত লোকায়ত জনগোষ্ঠীর সমগ্রতার বর্ণনা পায়। বাজীকর সম্প্রদায়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন এরা ম্যাজিক দেখায়, মেয়েরা নাচে, গান গায়। পুরুষেরা ঢোল বাজিয়ে গান গায় সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে এরা গান বাঁধে। এই বাজিকর শ্রেণী রাঢ় বাংলার লোকায়ত জীবনের একটি অংশ। 'নারী ও নাগিনী', 'যাদুকরী', 'বেদেনী', 'সাপুড়ের গল্প', 'মরুর মায়া', 'পিঞ্জর', 'যাদুকরের মৃত্যু', 'আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শেরআলী' প্রভৃতি গল্পে লেখক সাপুড়ে বেদে, বাজিকর, যাযাবর শ্রেণী, বাজি বা সার্কাস প্রদর্শনকারী প্রভৃতি গোষ্ঠীর জীবনাচরণ প্রত্যক্ষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যাযাবর শ্রেণীর লোকজন বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করত। ক্ষণস্থায়ী জীবনে এরা কেউ কৃষিকাজ

করত, কেউ কেউ দৈহিক কসরত প্রদর্শন করত, কেউ কেউ ভেল্কিবাজি ও শিকার করত। স্থায়ী কোন ঘর ছিল না বলে তাদের হাঘরে বলে চিহ্নিত করা হত।[১৬] হাঘরে আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ শ্রেণী রাঢ় বাংলায় তারাশঙ্করের সময়ে ছিল।

ডাইনী গল্পে আছে বাউরী মেয়ের কথা। একদিকে সমাজ তাকে ডাইনি বানাচ্ছে অন্যদিকে সে নিজে সেই কুসংস্কারের ঘেরাটোপে বন্দী হয়ে পড়েছে।[১৭] 'ব্র্যাঘ্রচর্ম' রতন হাড়ির কথা,সুরতহাল রিপোর্ট গল্পে কড়ি বাউরির কথা ও কালাপাহাড় গল্পে প্রান্তজন মানুষের কথা ঘুরে ফিরে এসেছে। রাঢ় বাংলার জনজীবনে ডোম, হাড়ি-বাউরি এরা বেশিরভাগ সময়ে লাঠিয়াল হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করত। কাজের অভাব হলে চুরি-ডাকাতি করত। সুহলকুমার ভৌমিক ডোমদের প্রসঙ্গে বলেছেন সম্ভবত গোড়ার দিকে ডোমদের কাজ ছিল বাজনা বাজানো এবং অবসর সময়ে বাঁশের চুপড়ি ইত্যাদি তৈরি করে গ্রামে বিক্রয় করা। পরবর্তীকালে মৃতব্যক্তির জিনিসপত্র পরিষ্কার ও নগরের আবর্জনা পরিষ্কারের কাজে নিযুক্ত হয়। সাঁওতালদের বিবাহে ডোমদের বাজনার বিশেষ স্থান আছে। ডোমদের তিনভাগের দুভাগ বাস করে বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়ায়। ডোমদের মেয়েরা ধাইয়ের কাজ করে। ডোম গোষ্ঠী ঝুড়ি তৈরি করে এবং কৃষিকাজ করে।[১৮] তারাশঙ্করের সময়ে লাভপুর গ্রামে হাড়ি গোষ্ঠী ছিল। হাড়িদের মধ্যে যারা ভূঁইমালী নামে পরিচিত তারা কৃষিকাজ করে এবং ফুলহাড়ি নামে যারা আছে তারা ধাইয়ের কাজ করে। বাউরিরা সাধারণত জমি-জমা চাষাবাদের কাজ করে। এরা শারীরিকভাবে অন্য গোষ্ঠীর লোকদের তুলনায় দুর্বল। বাউরি বাড়ির মেয়েরা লোকের বাড়িতে কাপড় কাচা,বাসন মাজার কাজ করে।[১৯]

বৈষ্ণব, বাউল, শাক্ত এসব গোষ্ঠীবদ্ধ শ্রেণীকে লোকায়ত গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করা হয়। এরা কৃষি নির্ভর নয়, ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে। অপরদিকে শাক্তরা কৃষিকর্ম বা কুটির শিল্পে নিয়োজিত থেকে কিংবা সন্ন্যাসী হয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। তারাশঙ্কর 'রাইকমল' উপন্যাসের তৃতীয় মুদ্রণে উপন্যাসের প্রারম্ভে রাঢ়ভূমির কেন্দ্রবিন্দুকে বৈষ্ণব সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করেছেন। বৈষ্ণবরাই বোষ্টম হিসেবে পরিচিত হয়েছে পরবর্তীকালে। ব্রাহ্মণদের কাছে এরা অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণ্য রীতি-নীতি এরা মান্য করে না। বিবাহ বর্হিভূত যৌন সম্পর্ক বৈষ্ণবদের কাছে অবৈধ নয়, স্বাভাবিক ভাবে এসব তারা গ্রহণ করে। মালাচন্দন বা কণ্ঠীবদল করে এরা বিবাহ করে। সামাজিকভাবে অবৈধ সন্তানকে তারা স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। বৈষ্ণব-বাউল-শাক্ত এই অপ্রধান ধর্মে স্থিত হয়ে থাকে অন্য ধর্মচ্যুত বা পালিয়ে আসা মানুষজন। তন্ত্র সাধনায় শবসাধনা, বামাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি অনুষঙ্গ স্বাভাবিক ব্যাপার। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রসকলি', 'হারানো সুর', 'রাইকমল', 'প্রসাদমালা', 'মালাচন্দন', 'সর্বনাশী এলোকেশী', 'বাউল', 'ট্রিটি', 'ছলনাময়ী', 'একরাত্রি', 'ট্যারা' প্রভৃতি গল্পে রাঢ় বাংলার বৈষ্ণব, বাউল ও শাক্তদের লোকজীবন রূপায়িত হয়েছে। রাধা উপন্যাসে ইতিহাস আর বৈষ্ণব সংস্কৃতি এক সঙ্গে দেখেছেন তারাশঙ্কর। কেঁদুলির মেলায় বৈষ্ণব সমাজের অনুপক্ষ বিবরণ দিয়েছেন। বৈষ্ণব ধর্ম বাংলার নিম্নবর্গীয় সাধারণ মানুষদের রোমান্টিক-প্রণয় পিপাসা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর এই পরিমণ্ডলে বারবার ফিরে এসেছেন। কবি উপন্যাসে তারাশঙ্কর রাঢ় বাংলার পটভূমির মাত্রা, বৈষ্ণব সংস্কৃতিকে অধিগত করার মাত্রা, নিম্নবর্গের নায়কের সন্ধানের মাত্রা একাকার হয়ে গেছে।[২০]

তারাশঙ্কর গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম উপন্যাস ছাড়াও অন্যান্য উপন্যাসে সদগোপ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। সদগোপরা প্রাচীনকালে রাঢ় বাংলায় বিস্তীর্ণ গড়জঙ্গল এলাকায় গরু পালন করে জীবিকা নির্বাহ করত বলে তাদের বলা হত গো-পালক বা সংক্ষেপে গোপ সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা পরবর্তীকালে কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করে তাদের বলা হল সদগোপ এবং যারা শুধু গো-পালন ও দোহনের উপর নির্ভর করে তাদের নাম হয় গোপ বা গোয়ালা।[২১] বর্তমানে অবশ্য রাঢ়ের সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ কৃষিকাজ ও গরু পালন করে। কিন্তু জাতের উপাধি ও পদবীর মধ্যে দিয়ে প্রাচীন কালের গোষ্ঠীর কর্ম ও বর্ণভেদের পরিচয় পাওয়া যায়। গোপ বা সদগোপ বা গোয়ালারা রাঢ়ের লোকজীবনের একটি বিশাল অংশ জুড়ে রাঢ়ের কীর্তিগাথাকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। প্রকৃত পক্ষে গোপভূম ছিল বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা জুড়ে অরণ্যময় এক বিশাল ভূখণ্ড। ভারতের গোপ সম্প্রদায় আহার ও পল্লব নামে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। রাঢ়ের ভিতরে পল্লব গোপদের আধিক্য দেখা যায়। এছাড়া গোপেরা উজানী, মধু, যাদব ও গোয়ালা ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত এবং কৃষিকাজে নিযুক্ত যারা তারা চাষা সদগোপ নামে পরিচিত হয়।

বীরভূমের পটুয়ারা অন্য এলাকার যেমন মেদিনীপুর ও কলকাতার পটুয়াদের চেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিজ্ঞজনের মতে আদিতে এরা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী নিষাদ জাতির শ্রেণী ছিল, পরে হিন্দু সমাজের নিম্নগোত্রীয় স্তরে স্থান পায় এবং কালক্রমে মুসলমান হয়। তবু এরা হিন্দুদের আচার-সংস্কার পালন করে। পূজা করে, নামাযও পড়ে, মেয়েরা শাখা সিঁদুর পরে। উনিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে বীরভূমের অনেক গ্রামে বিশ ঘরের মতো পটুয়া বাস করত। পরবর্তীতেও বীরভূমের সিউড়ি, পাকুড়হাস, পানুড়ে, ইটাগড়িয়াতেও কিছু পটুয়ার বাস ছিল।[২২] তারাশঙ্করের সমকালীন সময়ে গৃহস্থ বন্ধুরা পটুয়া নারীদের দিয়ে কাঁথায় নকশা করিয়ে নিত কিন্তু পটুয়ারা নিম্নস্তরের বলে তাদের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলত। 'কামধেনু', 'রাঙাদিদি' গল্পে তারাশঙ্কর পটুয়া শ্রেণীর জীবন অঙ্কন করেছেন। মালাকার শ্রেণীরা প্রতিমা, দেবতার মূর্তি অঙ্কন করত, নকশা করত, প্রতিমা তৈরি করত। এই শ্রেণীও রাঢ় বাংলার লোকগোষ্ঠীর ঐতিহ্যময় অংশ।

বীরভূমের কীর্ণাহার অঞ্চলে এবং দামোদর ও অজয় নদের উভয় তীরে গন্ধবণিকদের বসবাস। রাঢ়ের পল্লীসমাজে তাদের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। রাঢ় বাংলায় তুর্কি আগমনের পর গন্ধবণিকরা তুর্কিদের প্রিয় হয়ে ওঠে এবং ব্যবসা প্রসারের ফলে সমৃদ্ধি অর্জন করে। তাদের বীরভূমের রেশম ও রেশম কাপড়ের ব্যবসা ছিল। ব্রাহ্মণদের সামাজিক প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেলে গন্ধবণিকদের গৌরব হ্রাস পায় এবং এই অবনতি বীরভূমের নবাবের কারণে তরান্বিত হয়। প্রাচীনকাল থেকে রাঢ় অঞ্চলে এই গন্ধবণিকদের ঐতিহ্য রয়েছে। 'ভুবনপুরের হাট' ও 'পদচিহ্ন' উপন্যাসে তারাশঙ্কর গন্ধবণিকদের কথা বলেছেন।[২৩]

রাঢ়ের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী। বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া জেলায় সাঁওতাল জনসমষ্টির চার ভাগের তিন ভাগ রয়েছে। অনুমান করা হয়, ১৯৩১ সালে বীরভূমের মোট জনসংখ্যার ৭.৫ শতাংশ ছিল সাঁওতাল। এসব সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। স্থানীয় বাঙালিদের চেয়ে সাঁওতালরা স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে সবল, কর্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু বলে কৃষি ও শিল্পকালে শ্রমিক হিসেবে তাদের চাহিদা বেশি ছিল। রাঢ় বাংলার লৌকিক সংস্কৃতিতে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অনেক অবদান রয়েছে। শান্ত ও সহিষ্ণু স্বভাবের জন্য তারা উচ্চবর্ণের শোষণের শিকার হয়েছে এবং প্রতারিত হয়েছে।[২৪] তারাশঙ্কর তাঁর পিসিমার কাছে বাল্যকালে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা শুনেছেন। নব্য ব্যবসায়ীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে সাঁওতালরা তাদের বহু শ্রমে করা আবাদী জমি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। 'শিলাসন', 'কমল মাঝির গল্প', 'একটি প্রেমের গল্প'', 'ঘাসের ফুল' প্রভৃতি গল্পে সাঁওতালদের জীবন তুলে ধরেছেন লেখক।

তারাশঙ্করের ছোটগল্প তাঁর কথাশিল্পের দর্পণস্ত প্রতিবিম্ব বা ঘটাকাশের মতো; আসল চিত্র বা রূপ তাঁর উপন্যাস। উপন্যাস রচনায় তারাশঙ্কর সিদ্ধির চাবি-কাঠি তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতার সীমানা। তিনি এই সীমানাকে পাঠকের সামনে রূপে রূপান্তরে তুলে ধরেছেন। তারাশঙ্করের প্রধান উপন্যাসগুলির রস পরিণতি ও পটভূমিকায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।চৈতালী ঘূর্ণি তার রচিত প্রথম উপন্যাস হলেও এর কাহিনী কাঠামোয় বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটা বিশেষ স্তর উপজীব্য। মূলত গ্রামীণ ও আধা-শাহরিক পটে উপন্যাসটির সমাজ বিধৃত। তৃণমূল উন্মুক্ত গ্রামীণ মানুষের শ্রমজীবীতে গোত্রান্তরের যে সমাজ-পট চৈতালি ঘূর্ণিতে অঙ্কিত, তা প্রাক-ধনতান্ত্রিক গ্রামীণ-সমাজের আরণ্যক বিশৃঙ্খলার প্রতিরূপ। গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক যাদের সম্পদ ও শিশুকে হরণ করে, ধনতান্ত্রিক কাঠামো তাদের সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে দেয়। নিরন্ন ব্যথিত প্রান্তিক শ্রমশীল মানুষের এই রকম অনিবার্য মৃত্যুর ভূমিকা রচনা করেছেন তারাশঙ্কর। গ্রামীণ সমাজের ভাঙ্গন, দারিদ্র্যপীড়িত কৃষিজীবী মানুষের গোত্রান্তর এবং মৃত্তিকামূল-সম্পৃক্ত জীবন থেকে উন্মুলন চৈতালি ঘূর্ণির কাহিনী। গোষ্ঠ-দামিনী-সুবল জীবনকথায় এই শিল্পভাষ্য স্পষ্টতই দুটি স্থানিক-পটে বিন্যস্ত; কালিন্দীর চর এর মালিকানা স্বত্বকে কেন্দ্র করে উল্লেখিত শ্রেণীবিরোধ প্রাণস্ফূর্তি পেলেও, যাদের কর্ম তৎপরতাকে উপলক্ষ্য করে নবোদ্ভিন্ন চরের শ্রীবৃদ্ধি- সেই সাঁওতাল সম্প্রদায়, তাদের যাযাবর জীবন যাপনের সংগ্রামদীপ্ত ইতিহাস, ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫খ্রি.) স্মৃতি-অনুষঙ্গ এবং দুই অর্থনৈতিক শ্রেণীর স্বার্থগত দ্বন্দ্বের চক্রে সাঁওতালদের বাস্তভিটা থেকে উন্মুলিত হয়ে যাযাবর জীবনে পুনর্নিক্ষিপ্ত হওয়ার কথা কথা কালিন্দী উপন্যাসে বিবেচনার এক অপরিহার্য প্রসঙ্গ।[২৫] সাঁওতালদের গোষ্ঠীবদ্ধ কৌমসমাজ থেকে সামন্ত ভূস্বামীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই, ধনিক-বুর্জোয়ার সর্বগ্রাসী ক্ষুধার পীড়ন,

উৎপাদন-যন্ত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থা কুক্ষিগতকরণ এবং সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে দীক্ষিত একটি চরিত্রের অভিপ্সার মধ্যে দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের ধারার বিভিন্ন যুগের স্তরসমূহ কালিন্দীতে সংকেতিক হয়েছে। সমাজ ও সমকালীন রাজনীতির এই যুগ মিলন শিল্পের আশ্রয়ী ইতিহাসের ধারাক্রমকেই প্রমূর্ত করেছে। কালিন্দী উপন্যাসের চারটি স্তর রায় চক্রবর্তী জমিদার, সদগোপচাষী, সাঁওতাল ও মিল মালিক। এই চারটি স্তরের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সম্পর্ক, আবার স্তরগুলোর অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন কালিন্দী নদীর ওপরের নতুন চরকে কেন্দ্র করে উপন্যাসে বিধৃত।[২৬] কালিন্দীতে আদিবাসী জীবনের ছবিটি খুব স্পষ্ট নয়, তবে এই পর্যায়ে তারাশঙ্কর আরো কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছেন, সেগুলো হল- 'তামসতপস্যা' (১৯৫২), 'জঙ্গলগড়' (১৯৬৪), 'অরণ্যবহ্নি' (১৯৬৬)। অরণ্যবহ্নি সাঁওতাল বিদ্রোহের উপর লেখা। জঙ্গলগড়ে রোমান্স- ইতিহাস আর আদিবাসী সমাজ থেকে হিন্দু সমাজের দিকে আকৃষ্ট হওয়া প্রান্তিক মানুষের সামাজিক সত্য অত্যন্ত সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তামস তপস্যায় প্রক্রিয়াটি আরও স্পষ্ট। ১৯৪৮ সালে, সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রান্তজন মানুষদের সমাজে স্থান দেবার কথা ভেবেছেন তারাশঙ্কর সমাজ সত্যের বিবেচনায় তামস তপস্যা ভারতীয় জাতি বর্গ বর্ণ বিভক্ত সমাজের অন্তর্বাস্তবতার আশ্চর্য উদাহরণ। এই উপন্যাসে চোখে দেখা বাস্তব ছবি আঁকেননি, তবে এখানে আছে তারাশঙ্করের সমাজ চেতনার প্রকাশ।[২৭]

গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম আসলে চন্ডীমণ্ডপকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ জীবনের টানাপোড়নকে তুলে এনেছে। কুসুমপুর, কঙ্কণা মহাগ্রাম শিবকালীপুর, দেখড়িয়া এই পঞ্চগ্রামের প্রান্তজন মানুষের প্রতিবাদের ফলে সামাজিক বিপর্যয় দেখা যায়। গণদেবতা - পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে তারাশঙ্কর সমাজের কামার, ছুতোর, মুচি, নাপিত, বায়েন, দাই, চৌকিদার, নদীর ঘাটের মাঝি, মাঠ আগলাদার প্রমুখ মানুষের কথা তুলে ধরে গান্ধীর আদর্শবাদে বিশ্বাস হয়ে প্রান্তিক মানুষদেরকে সমষ্টিগত ভাবে তারাশঙ্কর হরিজন নামে উপন্যাসে ব্যাখ্যা করেছেন। এই উপন্যাসে প্রান্তজনদের দুটি অংশ দেখা যায়। একদিকে হিন্দু মনোভাবাপন্ন যারা অধিকার বঞ্চিত প্রান্তজন অন্যদিকে মুসলমান সমাজের কালুশেখ ইরশাদ, রহম শেখ প্রমুখ প্রান্ত্যজদের কথা পাওয়া যায়।[২৮] ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠি গণদেবতা পঞ্চগ্রাম উপন্যাসের ঐতিহাসিক মূল্য নির্দেশনার ক্ষেত্রে স্পষ্টতা বলেছেন যে গ্রামীণ জীবনের অন্তর্নিহিত বহুস্তরভূত সামাজিক শ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্বের স্বরূপ উপন্যাসখানিতে উদঘাটিত হয়েছে এবং এই সংঘাতের পটভূমিকায় উপন্যাসের নায়ক দেবু মাস্টার কংগ্রেসের রাজনীতির পক্ষে জনমত গঠনে তৎপরতা প্রদর্শন করছে এবং অবশেষে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অহিংস ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংযুক্ত করে বিশিষ্ট জীবনবোধে উত্তীর্ণ হয়েছে। দেবু ও যতীন প্রান্তজন মানুষদেরকে নিয়ে গ্রামীন সমবায় গড়ে তুলেছেন।[২৯]

হাঁসুলি বাঁকের উপকথা-য় আছে কাহারদের কথা। এই উপন্যাসে একটি সংলাপে দেখা যায় প্রান্তজন কাহারদের পরিবর্তন বিরক্ত হয়ে ঘোষের বড়কর্তা বনওয়ারী কে বলে- 'গলায় তোরা পৈতে নেই বুঝলি? কাহার আর কাহার নাই, বামুন। তা পৈতে নিক কাহারেরা। শেষে একেবারে ক্ষেপে গিয়ে বললেন- এঁটো ভাত খাবে না, নেমন্তন্ন নেই। জুতো না খেয়ে সব মাথায় উঠেছে।[৩০] সমাজতাত্ত্বিক এম. এন শ্রীনিবাস ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সংস্কৃতয়ান কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন- নিম্নজাতি উচ্চজাতির আচার-ব্যবহার আদব-কায়দা অনুকরণ করে দাবি জানাচ্ছে, আমরা মোটে নিকৃষ্ট নই, ধর্ম চরণের ক্ষেত্রে আমরা উচ্চ জাতির সমান। এই দাবির সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্ত থাকত নবলব্ধ আর্থিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতা যার জোরে সেই জাতি বা তার নেতৃস্থানীয় অংশ, ধর্মাচরের ক্ষেত্রেও অধিকতর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করত। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের প্রায় সব অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির এই ধরনের সংস্কৃতায়ন প্রচেষ্টার কথা আমরা জানি।[৩১] তারাশঙ্কর হাঁসুলী বাঁকের উপন্যাসে কাহারদের কথা প্রসঙ্গে সংস্কৃতায়ন বিশেষ দিকটি তুলে ধরেছেন। বিশেষ গাছ, সাপ, মেঘ ইত্যাদিতে তারা দেবমাহাত্ম্য আরোপ করে। স্থানীয় ভাবে কাহার সম্প্রদায় বেহারা ও আটপৌরে দুটি ভাগে বিভক্ত। এদের সমাজ ব্যবস্থা কঠিন, নিয়ম-নিষেধের আবেষ্টনে ঘেরা। কাহার সম্প্রদায় আগে অর্থের বিনিময়ে নীলকরদের লাঠিয়াল হয়ে কাজ করত। নীলকরেরা চলে গেলে কাজের অভাবে চুরি ডাকাতি শুরু করে। কাহারদের নিজস্ব সাতটা উৎসব রয়েছে, যেমন ধর্মপূজা, পৌষলক্ষ্মী, নবান্ন, গাজন, মনসাপূজা, ভাঁজো পরব, অম্বুবাচী। কোঠা বা দালান করলে মৃত্যু হয় অথবা জাত বা ধর্ম নষ্ট হয়। এই বিশ্বাসে আস্থাশীল কাহার

সম্প্রদায়। বাগদিদের মধ্যে যারা পালকি বহন করে তাদের বলে বাগদি কাহার, যারা করে না তাদের শুধু বাগদি বলা হয়। কাহার গোষ্ঠী পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, বিহার এলাকায় বসবাস করে। ভারবহন, চাষাবাদ, পালকি বহন, ভূত্যের কাজ করে কাহার সম্প্রদায় জীবিকা নির্বাহ করে। হাঁসুলী বাঁকের কাছে মণ্ডলী ও কাদপুর গ্রামে তিনশো জন বাগদি কাহার বাস করে। কাহার জাতি অতিলৌকিক জগৎ সম্পর্কে সচেতন থাকে সবসময়। কাহারদের বিশ্বাস তাদের পাপের কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ঘটনা, মহামারী ঘটে থাকে। হাঁসুলি বাঁকের উপকথায় কাহার সমাজের গোষ্ঠী ভেঙে জাতি আর জাতি ভেঙে ব্যক্তি বা শ্রেণী হবার ইতিহাসের নিরিখে বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী উপন্যাস সন্দেহ নেই। এখানকার ইতিহাসবোধ, নিম্নবর্গের ইতিহাসবোধ তারাশঙ্কর ভ্রান্তদর্শী, তাই অনুমান করে লিখে গিয়েছেন। নতুবা এই নবতরঙ্গ ইদানিং ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও রাজনীতির বাস্তব।[৩২] তারাশঙ্কর মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশেছেন বলেই এমনটি পেরেছেন।

'চৈতালি ঘূর্ণি', 'রাইকমল', 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'কবি', 'তামস তপস্যা', 'পদচিহ্ন', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'আরোগ্য নিকেতন', 'চাঁপাডাঙ্গার বৌ', 'কালান্তর', 'রাধা', 'ভুবনপুরের হাট', 'স্বর্গমর্ত্য', 'অরণ্যবহ্নি ও গুরুদক্ষিণা', 'জনপদ' উপন্যাসগুলিতে রাঢ়বাংলার বিভিন্ন স্থানের কথা যেমন পায়। তেমন ঐ অঞ্চলের সদগোপ, মুচি, ডোম, ভল্লা, বাগদি, বাউরি, বাউল, কৈবর্ত, সাহা, সাঁওতাল, হাঘরে বিভিন্ন প্রান্তিক সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস জানতে পারি।কখন তা ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে গোষ্ঠীগত তথা সার্বিক প্রান্তিক সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। গৌরীহর মিত্র সঙ্কলিত বীরভূমের ইতিহাস গ্রন্থে তারাশঙ্কর বর্ণিত বিভিন্ন জনজাতি বা প্রান্তজন মানুষের সুন্দর আলোচনা আছে।[৩৩] ভীষ্মদেব চৌধরী 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সমাজ ও রাজনীতি' গ্রন্থে লেখকের রচনাকে দুটি পর্বে যথা - প্রথম পর্বের (১৯২৮-১৯৪৭) রচনায় সমকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতি, সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সামাজিক পরিবর্তন ও গ্রামের প্রান্তিক মানুষদের জীবনভাষ্য ইত্যাদি বিষয়, দ্বিতীয় পর্বে (১৯৪৭-১৯৭১) ইতিহাস বেদনাজনক ভাবে বাস্তবতা থেকে পশ্চাদপসরণের ইতিহাস। ইতিহাস রোমান্স, কাহিনী-কথা উপকথার জগতে আশ্রয় গ্রহণ করলেও গঠনশৈলীগত পুনরাবৃত্তির কারণেও এসব উপন্যাস হয়ে ওঠেনি স্বতন্ত্র্যসন্ধানী। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় কাহার সম্প্রদায় ও নাগিনী কন্যার কাহিনী উপন্যাসে বেদে সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ আছে। দুটি রচনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান পাঁচবছর হলেও প্রথম পর্বের রচনায় ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি ও ইতিহাস যেভাবে ফুটে উঠেছে, দ্বিতীয় পর্বের রচনায় সমাজগতি ও সমাজসত্যের পটভূমিকায় প্রান্তজন মানুষের লোকসংস্কৃতি ও উপকথা র জগৎ উদ্ভাসিত হলেও ঔপন্যাসিকের পূর্ব-অর্জিত কালজ্ঞান ও ইতিহাসচেতনার স্বাক্ষর এতে অনুপস্থিত।[৩৪] শেষের দিকের উপন্যাসগুলোতে বারাঙ্গনা জীবন, অপরাধীদের স্তরে নেমে যাওয়া নিম্নশ্রেণীর মানুষদের নিয়ে লিখেছেন। এই পর্যায়ের লেখা নিশিপদ্ম ও ফরিয়াদ। ডাকহরকরা দীনুর চরিত্র রাঢ়-বাংলার পটভূমিতে রচিত এই নিম্নবর্গের আর্দশনিষ্ঠ মানুষটির সততা ও কর্তব্যপরায়ণতার যে ছবি এঁকেছেন তা বাস্তব সমাজের ইতিহাসকে নতুন করে জানতে ইচ্ছা করবে।[৩৫] প্রথম উপন্যাস চৈতালী ঘূর্ণিতে কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজের অবক্ষয় ও প্রান্তিক মানুষের জীবন চরিত রচনার মাধ্যমে যেমন ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন শেষ উপন্যাস ফরিয়াদেও তেমন প্রান্তজন মানুষের কথা পায়। রাঢ় এবং বিশেষভাবে বীরভূমের জনবিন্যাসের স্বতন্ত্র বিষয়ে বিনয় ঘোষ বলেছেন যে এখানে মুসলমান, উচ্চবর্ণের হিন্দু যথেষ্ট আছেন, কিন্তু তারা স্থানে হাড়ি, বাগদি, বাউরী, ডোম ও সাঁওতালদের সংখ্যাধিক্য লক্ষণীয় অর্থাৎ এদিককার যে গ্রামসমাজ তার চেহারাই আলাদা।[৩৬] তারাশঙ্কর তার উপন্যাসে গান্ধীজির মর্তাদশে বিশ্বাসী হয়ে নিম্নবর্গের মানুষদের হরিজন হিসাবে উল্লেখ করলেও প্রান্তজন মানুষদের অর্থনৈতিক ও বৃত্তিজীবী শ্রেণী হিসেবে উল্লেখ করেছেন- যার মধ্যে আছে নানা স্তরের চাষী, ছুতার, কামার, মুচি, ডোম, নাপিত, বেদে সাপুড়ে, পাটুয়া আর আছে বৈষ্ণব, বাউল, শাক্ত, তান্ত্রিক, সন্ন্যাসী ইত্যাদি ধর্মীয় সম্প্রদায়।[৩৭]

রাঢ়বাংলার পরিবেশ ও স্থানের কথা উল্লেখ করার সঙ্গে প্রান্তজন মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাসও তুলে ধরেছেন। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে মুসলিমদের আগমনের ফলে লৌকিক হিন্দু ধর্ম আচার ক্রমে সংকুচিত হয়ে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে এবং স্থান বিশেষ অস্তিত্ব রক্ষা করেছে নিম্নশ্রেণীর মানুষরা। রাঢ় বাংলায় মুসলমান ধর্মের প্রতিপত্তি বেশী

নয় বলে ছোট ছোট ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি নিজেদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পেরেছে। বিশেষভাবে বীরভূমের শাক্ত,বৈষ্ণব ও লৌকিক ধর্মের সহ অবস্থান ও কিছু ক্ষেত্রে সমন্বয় লক্ষণীয়। এখানে মুসলমান ধর্মও কিছু পরিমাণের লৌকিক বা কৌম ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবধর্ম ও এই ধর্মের সুচীন ঐতিহ্যের ও স্থানের কথা রাইকমল, স্বর্গমত, রাধা ইত্যাদি উপন্যাস উঠে এসেছে। বীরভূম ও তার সীমান্ত বহু বৈষ্ণব তীর্থস্থান বর্তমান যেমন জয়দেব কেন্দুলী, চন্ডীদাস, নানুর, বিশ্বমঙ্গল, বেলুরিয়া, নিত্যানন্দের জন্মস্থান এক চন্ডাগ্রাম, গুপ্ত বৃন্দাবন নামে কথিত বীরচন্দ্রপুর ইত্যাদি। বাউল সম্প্রদায় ও তাদের সংগীতকে বীরভূমের লোক জীবনের বিশিষ্ট অঙ্গ তথা বঙ্গসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ বলে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাংলার বাউলদের স্বতন্ত্র চরিত্র খুঁজে পেয়েছেন।[৩৮] তারাপীঠ, উদ্ধারনপুর, বক্রেশ্বর, লাভপুর সাঁইথিয়া প্রভৃতি স্থানে শাক্তপীঠ ও উপ প্রজাতি অস্তিত্ব ধর্মচর্চার অস্তিত্ব থেকে এই জেলার শাক্ত ধর্মচর্চার প্রবণতা ও ব্যাপকতা সহজে উপলব্ধি করা যায়। তারাশঙ্করের উপন্যাসে বিভিন্ন শাক্তবিগ্রহের নাম ও জনপ্রিয়তার কথা আছে। যেমন- ভাঙ্গাকালী, জয়ন্তীমঙ্গলা কালী, বুড়াকালী, শ্মশানেশ্বরী কালী, বাকুলের মা শ্মশানকালী ইত্যাদি। বিভিন্ন উপন্যাসে প্রান্তজন মানুষের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পূজাপার্বন, ব্রতকথা, দেবদেবী বিগ্রহ ইত্যাদি বহুবিবরণ পাওয়া যায়। দেবতা হিসাবে কর্তাঠাকুর, কালারুদ্র, ফুল্লরা বা অট্টহাস, মাচন্ডিকা, দেবীচামুন্ডা, ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজ নাম পাওয়া যায়। ধর্মরাজ আদিতে ডোম জাতির দেবতা, ডোমরাই ছিলেন পূজারী। এখন হাড়ি, ডোম, বাউরী, মুচি এবং বাগদিদের মধ্যে এই পুজোর অধিক প্রচলন। ধর্ম পূজার উপকরণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে যে ইতিহাস পাওয়া যায় সেখানে চরক, গাজন, বাশফোঁড়া এবং সং ও ভরনামা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ও মাটির ঘোড়া পুজোর অন্যতম উপকরণ। গাজন ও চড়ক নিম্নজাতি মানুষের উল্লেখযোগ্য উৎসব। বানগোঁসাই, বানেশ্বর ও বানেশ্বরী গাজনের শেষে পয়লা বৈশাখের একটি অনুষ্ঠান। হাড়ি, ডোম, মুচি, বাউরি ও বাগদী স্তরের লোকরা ঢাক, কাঁসা, শিঙা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র লাঠিসহ নৃত্য করতে করতে গ্রাম জুড়ে মিছিল করে। বোলান, ঝুমুর ও ভাসান, কবিগান ও আলকাপ গানের আসর বসে বিভিন্ন পুজো ও মেলাকে উপলক্ষ করে। হরিজন শ্রেণীর মানুষের ধারণা শিব এক বছর পর পয়লা চৈত্র নিদ্রাভঙ্গ করে ওঠেন এবং চন্দ্র সূর্যকে বছর শেষে করতে বলেন। ভাঁজো বীরভূমের বাগদি, ডোম, কাহার হাড়ি, বায়েন বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে একটি পুজো রূপেই প্রচলিত।[৩৯] এছাড়া মনসাপূজা, ইদপূজো, সেঁজুতি বা সাজবাত্তি, ইতলক্ষী পৌষ অগলানোপর্ব, বাউলবাঁধা, নীলপূজা প্রচুর পুজোর কথা তারাশঙ্করের লেখায় পাওয়া যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সারাজীবন সাধারণ মানুষ ও পল্লীবাংলার সমাজের রূপ সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। তার গল্পে উঠে এসেছে প্রান্তজন মানুষের কথা। তাদের আচার, সমাজ তাদের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান তথা জীবনের মনের অচেনা অজানা গলিপথ আবিষ্কৃত হয়েছে তার গল্পে। সমাজতন্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা এবং সামাজিক ইতিহাসের উত্থান পতনের কাহিনীও রসের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণ সমাজের উদার আমন্ত্রণের ফলেও যে ব্রাত্যগোত্রহীন মানুষকে সমাজগন্ডির ভিতরে আনা সম্ভব হয়নি,অথচ যারা এই দেশের মাটির বুকে যুগ যুগ ধরে লালিত হচ্ছে, তাদের আদিম সংস্কৃতি প্রকৃতি নিয়ে একবারে মাটির সঙ্গে মিশে আছে, তাদের তিনি সাহিত্যের আঙ্গিনায় আহবান করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তার উপন্যাসে উচ্চ-নিচুর ভেদাভেদ যেভাবে দেখিয়েছেন তা অনেকটা ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক লুই দুমোঁর ভাবধারার সঙ্গে মিলে যায়। লুই দুমোঁ বলেছেন সামগ্রিক সমাজের প্রয়োজনেই উচ্চনীচের প্রভেদটা জরুরী, কারণ নিম্নজাতি যেমন উচ্চের সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারবেন না, উচ্চও তেমন নিম্নের সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারবে না। এই সামগ্রিক প্রয়োজনের বোধ থেকে সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ ধর্ম, যার থেকে বিশেষ বিশেষ জাতির কর্তব্য নির্ধারিত হয়ে তৈরি হয়েছে জাতিধর্ম। জার্তিধর্ম থেকে বিচ্যুত মানে সাধারণ ধর্মের সংকট, কারণ প্রতিটি জাতি সামগ্রিক সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতিটি জাতি নিজস্ব স্থান বা মর্যাদা একমাত্র সামগ্রীক কাঠামোর মধ্য নির্ধারিত হতে পারে, স্বতন্ত্রভাবে তার কোন অস্তিত্ব বা অর্থ নেই।[৪০] যদিও তার সাহিত্যকে বিভিন্ন ব্যক্তিরা সমালোচনা করছেন। বিশিষ্ট মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ভবানী সেন মার্কসবাদী পত্রিকায় 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' শীর্ষক প্রবন্ধে তীব্র সমালোচনা করে লেখেন "তারাশঙ্করবাবু তাঁর সাহিত্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সূক্ষ্মভাবে গান্ধীপন্থী ব্যক্তিত্ববাদেরই মহিমা কীর্তন করেছেন, ইতিহাসের অগ্রগতি এবং ধনতন্ত্রের শোষণ এবং অবিচার সম্বন্ধে তাঁর সাহিত্য যে চেতনা আছে তা একটি মাত্র মধ্যমণিকে কেন্দ্র

করে সাজানো, সেই মধ্যমণিটি হচ্ছে মহাত্মার মতো পুরুষ-শ্রেষ্ঠের সৃজনী প্রতিভা এবং অগণিত অসহায় জনগণের করুন আর্তনাদ। ইতিহাসের অবাস্তব দৃষ্টি তারাশঙ্করবাবুর সাহিত্যকে অবাস্তব ভাববাদী সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করেছে।"[৪১] সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ না হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যের দৃষ্টিতে সমাজের ভিত্তিকাঠামোতে প্রান্তজন শ্রেণীর অবস্থান, আচার আচরণ, তাদের জীবনধারণ পদ্ধতি গভীর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তৈরি সামাজিক ছোটোগল্প ও উপন্যাসগুলি সময় ও সমাজ জীবনের অমূল্য সন্দর্ভ বলা যেতে পারে।

Reference :

১. অতীত নিয়ে ইতিহাসের কারবার, অতীতকে ইতিহাসে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কখন সাহিত্য, কখন দর্শন, কখন বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় এসেছে। অন্যান্য বিষয়ের থেকে ইতিহাসকে স্বতন্ত্র হিসাবে দেখাতে ইতিহাস দর্শনের উৎপত্তি। ইতিহাস দর্শনের আলোচনা মার্ক ব্লখের The Historian's craft, পিয়েতর হাইলের Debates with Historians, ই. এইচ. কারের What is History?, কলিংউডের Idea of History,ফ্রান্সের 'Annals', ইংল্যান্ডের 'Past and Present', লাদুরি The Territory of the Historian ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। সামাজিক মানুষের বিপুল কর্মশালার একটুখানি কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করে ইতিহাস। মেকলের কালে ইতিহাস সাহিত্যের অন্যতম শাখা রূপে পরিগণিত হত।

২. ঘোষ, ড. শীতল, এরিস্টটলের সাহিত্য তত্ত্ব, বর্ণালী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৪, ৭৭-৭৯

৩. ঘোষ, ড. শীতল, মার্কসীয় সাহিত্য তত্ত্ব, বর্ণালী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৯৯-১০৬

৪. ড. সৌমিত্র, শ্রীমান ও অন্যান্য, সম্পাদিত ইতিকথা, আনন্দ ভট্টাচার্য, ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী: ইতিহাস,সাহিত্য ও দর্শন চর্চা, একদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই, ২০২৩, পৃ. ৪০

৫. চৌধুরী, ভীমদেব, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমাজ ও রাজনীতি, কথা প্রকাশ, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ২০

৬. https://greatwestbengal.com/tarasankar-bandyopadhyay-biography/

৭. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পাদিত), শ্রেষ্ঠ গল্প তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ৬৫

৮. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, তারাশঙ্করের বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি, রত্নাবলী, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২২

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

১১. চৌধুরী, অরুণ (সম্পা.), গৌরীহর মিত্র সঙ্কলিত বীরভূমের ইতিহাস, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৩০৮

১২. চৌধুরী, অরুণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩-০৫

১৩. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১৪. ভট্টাচার্য, জগদীশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮, ১৪৯

১৫. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯

১৭. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

১৮. চৌধুরী, অরুণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১

২০. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

২১. চৌধুরী, অরুণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

২২. মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত কুমার, তারাশঙ্করের উপন্যাসে রাঢ়ের প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন: আঞ্চলিক লক্ষ্য ও তারাশঙ্করের সাফল্য একটি মূল্যায়ন, পি. এইচ. ডি অভিসন্দর্ভ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫, ১৩৪

২৩. প্রাগুক্ত, ১৩১

২৪. চৌধুরী, অরুণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯-৫০

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ (সম্পাদিত), তারাশঙ্করের অন্বেষা, পুস্তক বিপনি, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৭. পৃ. ৭-৮

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

২৭. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত পৃ. ২৭-২৮

২৮. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

২৯. চৌধুরী, ভীমদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

৩০. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী (হাঁসুলী বাঁকের উপকথা), সপ্তম খন্ড, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৩৭৫

৩১. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, ইতিহাসের উত্তরাধিকার, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৯ পৃ. ৮৮

৩২. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত, ৩৮

৩৩. চৌধুরী, অরুণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১-১৫

৩৪. চৌধুরী, ভীমদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮

৩৫. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৩৬. রঞ্জিত কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

৩৭. মুখোপাধ্যায়, কামদেব, তারাশঙ্করের ছোটগল্পে সমাজতত্ত্ব, পি. এইচ. ডি অভিসন্দর্ভ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭, পৃ. ৪৬

৩৮. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, বাংলার বাউল ও বাউল গান, ওরিয়েন্ট বুক কোং, কলকাতা, ১৩৭৮, পৃ. ৩৭০

৩৯. রঞ্জিত কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১৩২

৪০. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৪১. দাশ, ধনঞ্জয় (সম্পা), মার্কসবাদী সাহিত্যে-বিতর্ক, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ১০-১১